Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:2(4), February 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

ন্যায়দর্শনে ঈশ্বর : একটি পর্যালোচনা

God in Nyaya Philosophy : A Review

Dr. Raspoti Mandal (ড. রাসপতি মণ্ডল)

Assistant Professor, Department of Philosophy, Bangabasi College, Kolkata, India

সারসংক্ষেপ : ন্যায়দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি গৌতম তাঁর ন্যায়সূত্রে ষোলোটি পদার্থের তালিকায় ঈশ্বরের পৃথক উল্লেখ না করলেও নৈয়ায়িকদের নিরীশ্বরবাদী বলা যায় না। কারণ, তিনি চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের তিনটি সূত্রে ঈশ্বরের কথা বলেছেন। তাছাড়া, পরবর্তীকালে বাৎস্যায়ন, উদ্যোতকর, বাচস্পতি মিশ্র, উদয়নাচার্য, গঙ্গেশোপাধ্যায়, জয়ন্ত ভট্ট প্রমুখ নৈয়ায়িকগণ ঈশ্বর সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ন্যায়শাস্ত্রে আত্মাকে একটি মৌলিক তত্ত্ব হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে। তাঁদের মতে আত্মা দ্বিবিধ— জীবাত্মা ও পরমাত্মা। এই পরমাত্মাই হলো ঈশ্বর। নৈয়ায়িকদের মতে, ঈশ্বর ইন্দ্রিয়গোচর না হলেও যুক্তির দ্বারা তাঁর অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করা সম্ভব। তাঁরা ঈশ্বরকে জগতের নিমিত্ত কারণ বলে মানেন। পরমাণুর পুঞ্জ বা সমবায় হলো উপাদান-কারণ, পরমাণুসমূহের সংযোগ অসমবায়ী কারণ, আর জীবের অদৃষ্ট সহকারী কারণ— এসবের সমন্বয়ে জগৎ উৎপত্তি লাভ করে; আর এই সমগ্র প্রক্রিয়ায় নিয়ামকরূপে পরমাত্মা বা ঈশ্বরের সত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়। ঈশ্বর কর্মনিয়মের নিয়ন্ত্রক ও পরিচালক। জীব যে কর্ম সম্পাদন করে, তার উপযুক্ত ফল তিনি অদৃষ্টের নিয়মানুসারে বিধান করেন। জীবের ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতাও মূলত ঈশ্বরের করুণাশক্তির ওপর নির্ভরশীল। তাঁর ইচ্ছা, প্রেরণা ও অন্তর্নিহিত নির্দেশনাই জীবকে কর্মে প্রবর্তিত করে।

মূল শব্দ : জীবাত্মা, পরমাত্মা (ঈশ্বর), ঈশ্বরের স্বরূপ, অদৃষ্ট, নিমিত্তকারণ, বেদ-কর্তা।

Abstract : Although Maharshi Gautama, the founder of the Nyāya school, does not explicitly list 'Īśvara' as one of the sixteen categories (padārthas) in his Nyāyasūtra, the Naiyāyikas cannot be regarded as atheists. For, in three sūtras of the first āhnika of the fourth chapter, he does refer to God. Moreover, later Naiyāyikas such as Vātsyāyana, Uddyotakara, Vācaspati Miśra, Udayanācārya, Gaṅgeśopādhyāya, and Jayanta Bhaṭṭa have discussed the nature of God in considerable detail. Nyāya philosophy accepts the self (ātman) as a fundamental principle. According to the Naiyāyikas, the self is of two kinds— the individual self (jīvātman) and the supreme self (paramātman). This supreme self is Īśvara. Although God is not perceptible to the senses, the Naiyāyikas hold that His existence can be established through logical reasoning. They regard Īśvara as the efficient cause (nimitta-kāraṇa) of the world. Aggregates of atoms serve as the material cause, the conjunction of atoms constitutes the non-inherent cause (asamavāyi-kāraṇa), and the unseen potency (adṛṣṭa) of living beings functions as an auxiliary cause. Through the coordinated action of these causes, the world comes into being, and in this entire process the governing presence of the supreme self— Īśvara— is affirmed. Īśvara is the controller and regulator of the law of karma. He dispenses the proper results of actions performed by beings according to the order of adṛṣṭa. Even the freedom of volition and action that living beings possess ultimately depends on His grace. It is His will, His prompting, and His inner guidance that lead beings to engage in their respective actions.

Keywords : Jīvātman, Paramātman (Īśvara), The Nature of God (Īśvara-svarūpa), Adṛṣṭa, Nimitta-kāraṇa, Veda-kartā.

জীব ভিন্ন ভিন্ন ফল লাভের উদ্দেশ্যে নানা ধরনের কর্ম সম্পাদন করে। কিন্তু প্রত্যেক কর্ম থেকেই যে কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ হয়, এমনটি দেখা যায় না। বহু কর্মই ব্যর্থ হয়ে যায়। সে কারণে কর্মফল-প্রাপ্তির বিষয়ে জীব সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়। যদি জীব নিজের করা কর্মের ফল স্বেচ্ছায়, স্বাধীনভাবে অর্জন করতে পারতো, তবে সে কখনো দুঃখভোগ করতো না, এবং তার কোনো কাজই ব্যর্থ হতো না। কিন্তু বাস্তবে বিষয়টি এমন নয়। জীব যে সুখ বা দুঃখ ভোগ করে, যে সব কর্মফল অনুভব করে, সেগুলি এমন এক সত্ত্বার অধীন— যিনি সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান, তিনিই ঈশ্বর। অতএব, জগতের পরিচালনা এবং জীবের শুভাশুভ কর্মের ফল প্রদান— এই দুই-ই ঈশ্বরের অধীন। মহর্ষি গৌতম **"না পুরুষকর্মাভাবে ফলানিষ্পত্তেঃ।"**[1] এই সূত্রের মাধ্যমে কর্মনিরপেক্ষ ঈশ্বরকারণবাদকে খণ্ডন করেছেন। অর্থাৎ, যদি কেবল ঈশ্বরকে কর্মফলদাতা হিসাবে মানা হয় এবং জীবের কর্মকে উপেক্ষা করা হয়, তবে জীব কিছু না করেই

[1]. তর্কবাগীশ, ফণীভূষণ। *ন্যায়দর্শন (ন্যায়সূত্র ও ভাষ্য, চতুর্থ খণ্ড)*। কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৮, পৃঃ ৫০।

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:2(4), February 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

ফল পেতে শুরু করবে। কিন্তু কোথাও দেখা যায় না যে কর্ম ছাড়া ফল পাওয়া যায়; বরং কর্ম করলেই ফল পাওয়ার আশা থাকে। তাই ঈশ্বরকে জগতের কারণ বলতে হলে তাঁকে কর্ম-সাপেক্ষ (কর্মজাত 'অদৃষ্ট' দ্বারা পরিচালিত) বলেই গ্রহণ করতে হবে। কর্মনিরপেক্ষ ঈশ্বর জগতের বিধান করতে পারেন না। এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে— তাহলে জীবের কর্মকেই যদি জগতের কারণ বলা যায়? জীব তার কর্মানুসারে সুখ-দুঃখ ভোগ করে, 'দৃষ্টি' প্রভৃতি ঘটে; তাহলে আলাদা করে ঈশ্বরকে কারণ মানার প্রয়োজন কী?

এই প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি গৌতম তাঁর নিজস্ব মত প্রতিষ্ঠা করে বলেছেন— **"তৎকারিতত্বাদহেতুঃ।"**[2] অর্থাৎ, পূর্বসূত্রে যেটি হেতু বলা হয়েছে, তার দ্বারা বোঝা যায় যে, যেহেতু জগতের কার্যস্বরূপ ঘটনাগুলির উৎপত্তি এমন এক সত্ত্বার দ্বারা সংঘটিত হয় যিনি জীবের কর্মফলের সুবিন্যস্ত বিধাতা, তাই ঈশ্বরকেই জগতের কারণ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। জীবের কর্ম ফল দেয় ঠিকই, কিন্তু সেই কর্মফলকে যথাযথভাবে বিধান করেন যিনি, তিনিই পরম কারণ— ঈশ্বর।

ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের মতে ঈশ্বর সেই আত্মবিশেষ, যিনি বুদ্ধি, নিত্যজ্ঞান, সমাধি, ধর্মরূপ প্রবৃত্তি এবং অষ্টঐশ্বর্য—অণিমা, মহিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও যত্রকামাবসায়িত্ব— প্রভৃতি অতিমানবিক গুণে সম্পন্ন; তবে তিনি সাধারণ জীব-আত্মার মতো অধর্ম, মিথ্যাজ্ঞান, ক্লেশ, প্রমাদ ইত্যাদি দোষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত— **"গুণবিশিষ্টমাত্মান্তরমাশ্বরঃ। তস্য আত্মকল্পাৎ কল্পান্তরানুপপত্তিঃ। অধর্ম-মিথ্যাজ্ঞান-প্রমাদহান্যা ধর্মজ্ঞানসমাধি-সম্পদা চ বিশিষ্টম্ আত্মান্তরম্ ঈশ্বরঃ। তস্য চ ধর্মসমাধিফলম্ অণিমাদ্যষ্টবিধমৈশ্বর্য্যম্।"**[3] ঈশ্বর কোনো ইন্দ্রিয়গত বা শারীরিক কর্ম না করেও কেবল সঙ্কল্পমাত্রে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় সম্পন্ন করেন এবং তাঁর এই সঙ্কল্পরূপ অন্তঃকর্মই ধর্ম ও ঐশ্বর্যের কারণ। তিনি সকল জীবের 'আপ্ত' বা বিশ্বস্ত পথপ্রদর্শক— যেমন পিতা সন্তানের কল্যাণকামী উপদেষ্টা, তেমনি ঈশ্বর সর্বজীবের হিতবিধানকারী; তবে এ উদাহরণ কেবল তাঁর নির্দেশযোগ্যতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, উৎপত্তি বা অংশত্ব নির্দেশ করে না। ঈশ্বর আত্মাতেই প্রতিষ্ঠিত, কারণ তাঁর মধ্যে এমন কোনো ধর্ম নেই যা তাঁকে আত্মা থেকে পৃথক কোনো পদার্থ প্রমাণ করে; তিনি বুদ্ধিধারী, সর্বজ্ঞ, সর্বদ্রষ্টা— এভাবে আগমও তাঁকে সগুণ আত্মবিশেষরূপে নির্দেশ করে। যদি ঈশ্বর জ্ঞানবুদ্ধিহীন হতেন, তবে তিনি অনির্বচনীয় হয়ে পড়তেন এবং প্রত্যক্ষ, অনুমান বা আগম কোনো মাধ্যমেই সিদ্ধ হতেন না। আবার ঈশ্বর যদি জীবের কর্মকে উপেক্ষা করে সরাসরি দৃষ্টি বা ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হতেন, তবে জগতে বৈষম্য, পক্ষপাত ও নিষ্ঠুরতার দোষ জন্মাত; তাই জীবের ধর্ম–অধর্মজাত অদৃষ্ট অনুযায়ী নিরপেক্ষভাবে কর্মফল প্রদান করাই তাঁর বিধান। এইভাবে বাৎস্যায়ন সগুণ, সর্বজ্ঞ, পক্ষপাতশূন্য ও সঙ্কল্পশক্তিসম্পন্ন ঈশ্বরকে ন্যায়দর্শনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

আচার্য উদ্যোতকরের মতে জগৎ-সৃষ্টি প্রত্যক্ষ উপাদানরূপ পরমাণুর দ্বারা হলেও পরমাণুগুলিকে সঠিক সময়ে কার্যে প্রবৃত্ত করার জন্য যে বুদ্ধিমান অধিষ্ঠাতা প্রয়োজন, সেই নিমিত্তকারণ হলো ঈশ্বর। এপ্রসঙ্গে তিনি ন্যায়বার্তিকে বলেন— **"যেনৈব ন্যায়েন নৈশ্বরস্য কারণত্বং সিদ্ধ্যতি, তেনৈবাস্তিত্বমিতি।"**[4] যে নিয়মে প্রমাণিত হয় যে ঈশ্বর কারণ, সেই একই নিয়মে তিনি প্রমাণ করেন যে তাঁর অস্তিত্ব আছে। জীবের কর্মফল প্রদান-যোগ্য সময়ে ঈশ্বর পরমাণুগুলিকে সংগঠিত করে বিভিন্ন দেহ ও কাঠামোর সৃষ্টি করেন এবং এভাবেই জীবের উপকার সাধন করেন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধির জন্য তিনি যে যুক্তি নিরূপণ করেন তা হলো— অচেতন পরমাণু স্বতঃক্রিয় হতে পারে না; যেমন অচেতন কুঠার নিজে কাঠ কাটতে পারে না, তেমনি পরমাণু-ক্রিয়াও পূর্ববর্তী কোনো বুদ্ধিমান শক্তির অধিষ্ঠান ব্যতীত সম্ভব নয়। মানব ইন্দ্রিয় পরমাণুকে প্রত্যক্ষ করতে না পারায় মানবাত্মা তার অধিষ্ঠাতা হতে পারে না; অতএব অতীন্দ্রিয় পরমাণুকে প্রত্যক্ষজ্ঞানসম্পন্ন এক সর্ববুদ্ধিমান সত্তাই ঈশ্বর অধিষ্ঠান করেন। অন্যদিকে নিস্বর্গবাদী সাংখ্য মতে প্রকৃতি নিজস্ব ত্রিগুণের বৈষম্য থেকেই জগতের কার্যপ্রবাহ সৃষ্টি করে, কিন্তু উদ্যোতকর দেখান যে ত্রিগুণের সাম্যভঙ্গ নিজে নিজে সম্ভব নয় এবং জড় প্রকৃতি বা পুরুষার্থ কেউই প্রকৃতির কার্যপ্রবাহের যথার্থ প্রবর্তক হতে পারে না; কারণ জড় পদার্থ কখনো স্বার্থ বা পরার্থ সাধনে নিজে নিজে প্রবৃত্ত হয় না এবং পুরুষার্থ নিজে যখন অপূর্ণ ও অনভিজ্ঞ, তখন সে আবার প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা হতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, দুধ নবজাতকের জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রবাহিত হয় না, এতে জীবের অদৃষ্ট ও ঈশ্বরের অধিষ্ঠানই কার্যকর; নচেৎ মৃত শিশুর ক্ষেত্রেও দুধ প্রবাহিত হতো। একইভাবে ধর্ম-অধর্মের কার্যকারিতা পরিচালনাতেও ঈশ্বরই একমাত্র যোগ্য অধিষ্ঠাতা, কারণ অচেতন ধর্ম–অধর্ম বা সীমাবদ্ধ, সর্বজ্ঞতাহীন জীবাত্মা পরমাণুকে প্রবৃত্ত করতে পারে না। 'ঈশ্বরে ক্রিয়া নেই'—এই আপত্তিও অমূলক, কারণ ন্যায়দর্শনে 'ক্রিয়া' দুই প্রকার— আখ্যাতার্থ (জ্ঞান, ইচ্ছা, প্রচেষ্টা) এবং বৈশেষিক 'কর্ম'; প্রথমটি ঈশ্বরে নিত্যভাবেই আছে, দ্বিতীয়টির (উত্‌ক্ষেপণাদির) অনুপস্থিতি কর্তৃত্ব নস্যাৎ করে না, যেমন নিষ্ক্রিয় তন্তুগুচ্ছ থেকেও পট উৎপন্ন হয়। এইসব যুক্তি বিশ্লেষণ করে উদ্যোতকর দেখান যে জড় উপাদানের কার্যসংগঠন, ধর্ম-অধর্মের ফলনিয়ন্ত্রণ, পরমাণুর ক্রিয়াসমূহের বুদ্ধিমান নিয়ন্ত্রণ এবং জগতের নৈর্ব্যক্তিক ন্যায়বিধান সবকিছুর জন্যই এক সর্বজ্ঞ, সর্ববুদ্ধিমান, নিত্য সত্তা প্রয়োজন; এবং সেই সত্তাই ন্যায়দর্শনের ঈশ্বর, যিনি জগতের একমাত্র নিমিত্তকারণ— **"তৎকারিতত্বাদিত্যেবং ব্রুবতা নিমিত্তকারণমীশ্বর ইত্যভ্যুপগতং ভবতি। যচ্চ নিমিত্তং তদিতরয়োঃ সমবায়িকারণাসমবায়িকারণয়োরনুগ্রাহকম্। যথা তূর্যাদি তন্তুনাং তৎসংযোগানাং চেতি। ঈশ্বরশ্চেজ্জগতো নিমিত্তম্।"**[5]

---

[2]. তদেব।

[3]. তদেব, পৃঃ ৭৪।

[4]. ঠাকুর, অনন্তলাল। *ন্যায়ভাষ্যবার্তিকম্* নিউ দিল্লি : আই. সি. পি. আর., ১৯৯৭, পৃঃ ৪৩৩।

[5]. ঠাকুর, অনন্তলাল। *ন্যায়ভাষ্যবার্তিকম্* নিউ দিল্লি : আই. সি. পি. আর., ১৯৯৭, পৃঃ ৪৩৩।

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:2(4), February 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

ন্যায়সূত্রের **"ঈশ্বরঃ কারণং, পুরুষকর্মাফল্যদর্শনাৎ।"**[6] এই অংশের 'ঈশ্বরঃ কারণং' বিষয়ে বার্ত্তিককার উদ্যোতকর ও তাৎপর্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যায় মতভেদ স্পষ্ট। উদ্যোতকর বলেন, সূত্রটির উদ্দেশ্য কেবল এই যে, ঈশ্বরই জগতের নিমিত্ত কারণ, এবং এখানে পূর্বপক্ষীদের যে কর্মনিরপেক্ষ, কেবল ঈশ্বর-কারণবাদ, তারই খণ্ডন উদ্দেশ্য। বাচস্পতি মিশ্র কিন্তু এই স্থানে পূর্বপক্ষ হিসেবে বেদান্তের ব্রহ্ম–উপাদান–কারণবাদ, বিশেষত ব্রহ্ম-পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদ উভয় মতকেই স্থাপন করেন। তাঁর মতে যেমন মাটি ঘট-রূপে, সোনা কুণ্ডল-রূপে পরিণত হয়, তেমনি ব্রহ্ম জগতের নামে-রূপে পরিণত হয়ে জগতের উপাদান-কারণ হয়; তবে ন্যায়ের মতে জগতের উপাদান-কারণ পরমাণু, এবং জীবের ধর্ম–অধর্মজাত 'অদৃষ্ট'কে কার্যোন্মুখ করে তাদের সমন্বয় সাধন করেন ঈশ্বর, তাই তিনি কেবল নিমিত্ত কারণ। যেহেতু ধর্ম–অধর্মের উপর নির্ভর করেও ঈশ্বর পরমাণুকে কার্যে প্রবৃত্ত করেন, তাই জীবকর্ম–সাপেক্ষ ঈশ্বরই জগতের কারণ— এটিই ন্যায়মতের অভিপ্রায়। বাচস্পতি দেখান যে এই সূত্র ব্রহ্ম-উপাদান–কারণতাও সমর্থন করে না; ন্যায়মতে জগতের একমাত্র নিমিত্ত কারণ ঈশ্বর। পরমাণুর পার্থক্যজ্ঞানে, জীবের ধর্ম–অধর্ম ও অদৃষ্টের জ্ঞানে এবং ফলবিধানে অন্য কোনো সত্তা সক্ষম নয়; ঈশ্বরই পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত, পরমাণু জীবের সঙ্গে যুক্ত, এবং জীবের সঙ্গে সমবায়-সম্বন্ধে যুক্ত ধর্ম–অধর্মের অধিষ্ঠাতা ঈশ্বর—এই সম্পর্ক-শৃঙ্খলে ঈশ্বরই অদৃষ্ট-অধিষ্ঠাতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। এরপর বাচস্পতি ঈশ্বরের প্রমাণে বেদ–কর্তৃত্ব যুক্তিও দেখান। যদিও ন্যায়সূত্রকার 'আপ্তপ্রামাণ্যাৎ' বলে বেদের প্রমাণযোগ্যতা নির্দেশ করেছেন, তাঁরা বেদকে অপৌরুষেয় বলেননি, কিংবা তার কর্তাকে ঈশ্বর বলে স্পষ্ট করেননি; এমনকি উদ্যোতকরও বলেননি। কিন্তু বাচস্পতি বলেন— বেদ এমন এক সর্বজ্ঞ, করুণাময় ঈশ্বরের উপদেশ, যিনি জীবের দুঃখ লাঘব ও হিতসাধনের জন্য দৃষ্টির বিধান করেছেন এবং পরে হিত–অহিতলক্ষণীয় আচরণ নির্দেশ করেছেন; বেদ তাই তাঁরই বাণী। শাক্যাদিদের গ্রন্থ ঈশ্বরবাক্য নয়, কারণ তারা সর্বজ্ঞ নন, জগৎস্রষ্টাও নন; ঋষিমুনিরাও সেগুলিকে প্রমাণ বলে গ্রহণ করেননি। অন্যদিকে বেদই ধর্মব্যবস্থার প্রাচীনতম ও সর্বাধিক প্রামাণ্য গ্রন্থ, এবং আয়ুর্বেদের মতো গ্রন্থেও বেদনির্দেশিত আচারের গ্রহণযোগ্যতা বেদের প্রামাণ্যতা প্রতিষ্ঠা করে। এইভাবে বাচস্পতি মিশ্র দেখান যে ন্যায়দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব-সিদ্ধির একটি প্রধান ভিত্তি হলো বেদ ঈশ্বরপ্রণীত, এবং এই ঈশ্বরই জগতের নিমিত্ত কারণ ও অদৃষ্ট–অধিষ্ঠাতা।

আচার্য উদয়ন ঈশ্বর-সিদ্ধির প্রসঙ্গে প্রধানত তিন দৃষ্টিকোণ থেকে অনুমান প্রতিষ্ঠা করেছেন—(ক) ঈশ্বর জগতের কর্তা বা নিমিত্ত কারণ, (খ) ঈশ্বর জীবের ধর্ম–অধর্মরূপ অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতা ও কর্মফল-দাতা, এবং (গ) সৃষ্টির আদিতে তিনিই বেদবাক্যের উপদেশ-প্রদানকারী। তাঁর 'ন্যায়কুসুমাঞ্জলি'তে ঈশ্বর-সিদ্ধির জন্য তিনি আটটি হেতুর কথা বলেছেন— **"কার্যায়োজন ধৃত্যাদেঃ পদাৎ প্রত্যয়তঃ শ্রুতেঃ। বাক্যাৎ সংখ্যাবিশেষাচ্চ সাধ্যো বিশ্ববিদব্যয়ঃ॥"**[7] কার্য, আয়োজন, ধৃতি, পদ, প্রত্যয়, শ্রুতি, বাক্য ও সংখ্যাবিশেষ উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, কার্যত্ব হেতুতে দেখানো হয় যে পৃথিবী ইত্যাদি দৃষ্ট জগৎ যেহেতু কার্য, তাই এর স্রষ্টাও অবশ্যই কোনো সচেতন কর্তা, যেমন কুম্ভকার মৃত্তিকা জেনে ও ইচ্ছা–প্রয়াস দ্বারা ঘট সৃষ্টি করে। জগতের উপাদান-কারণ পরমাণুর প্রত্যক্ষ-জ্ঞান শুধুমাত্র সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের পক্ষেই সম্ভব, তাই তিনিই জগতের কর্তা। দ্বিতীয়ত, আয়োজন হেতুতে বলা হয় যে সৃষ্টির আদিতে দুটি পরমাণুর সংযোগ যে ক্রিয়ায় ঘটে, তা অচেতন পরমাণুর স্বভাবতসিদ্ধ নয়; অচেতন শুধু চেতন-প্রচেষ্টায় ক্রিয়াশীল হয়। যেমন কুঠার কাঠ কাটে কেবল ছুতোরের প্রয়াসে। প্রলয়ের পরে যখন কোনো জীবের অস্তিত্ব থাকে না, তখন পরমাণুর এই প্রবৃত্তি করাতে সক্ষম কেবল ঈশ্বরই। গীতা ও স্মৃতিতেও বলা আছে— ঈশ্বরের অধিষ্ঠানে স্থাবর–জঙ্গমের উৎপত্তি হয়। তৃতীয়ত, ধৃতি-হেতু বলে মহাবিশ্বের পতন-নিবারণ বা ধারক-প্রচেষ্টা কোনো চৈতন্য সত্তার দ্বারাই সম্ভব, যেমন আকাশে কাঠ থাকে পৃথিবীর দ্বারা অধিষ্ঠিত হয়ে; উপনিষদ ও গীতাও বলে— পুরো বিশ্ব ঈশ্বরের ধৃত বা ধারণ করা। চতুর্থত, পদ-হেতুতে শব্দ ও অর্থের নিয়মিত সম্পর্ক (যেমন 'ঘট' শব্দে ঘটই বোঝায়, 'পট' নয়) কোনো সর্বজ্ঞ নিয়ন্ত্রকের দ্বারা প্রবর্তিত না হলে অনাদি ও অবিচল হতে পারে না; সৃষ্টি-আদিতে সকল জীব-অনুপস্থিতির সময় শব্দব্যবহার শাসন ও উপদেশদাতা ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। পঞ্চমত, প্রত্যয়-হেতুতে বলা হয় বেদের প্রামাণ্যতা তার বক্তার গুণজাত; যেহেতু বেদ-জ্ঞান নিখুঁত ও অব্যর্থ, তাই তার বক্তা অবশ্যই সর্বজ্ঞ ঈশ্বর। ষষ্ঠত, শ্রুতি-হেতুতেও বলা হয়— বেদ পৌরুষেয়, কিন্তু তার রচয়িতা কোনো মানব হতে পারে না, কারণ প্রলয়ে মানব লীন হয়, অথচ বেদ নাশ হয় না; তাই এর রচয়িতা নিত্য সর্বজ্ঞ ঈশ্বরই। সপ্তমত, বাক্য-হেতুতে প্রমাণ করা হয়— বেদ বাক্য, আর সকল বাক্যের বক্তা থাকে; মানব-বাক্য যেমন বক্তার পরিচয়ে চিহ্নিত, তেমনই বেদের বক্তার উল্লেখও শাস্ত্রে আছে— ঋগ্বেদে বলা হয়েছে যে বেদ ঈশ্বর থেকে প্রকাশিত; গীতায় কৃষ্ণ বলেন— "আমি বেদের কর্তা ও বেদের বিদাতা।" অষ্টমত, দ্ব্যণুক-সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে যে অণু ও দ্ব্যণুক উভয়ই অতি সূক্ষ্ম হলেও কার্যদ্রব্যের পরিমাণ সাধারণত কারণ-দ্রব্যের পরিমাণ থেকেই উৎপন্ন হয়। কিন্তু পরমাণুর নিজস্ব পরিমাণকে আর কোনো কারণ দ্বারা নির্ধারিত বলা যায় না। তাই দ্ব্যণুকের পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে পরমাণুদ্বয়ের 'দ্বিত্বসংখ্যা'–কেই কারণ হিসেবে মানতে হয়। কিন্তু এই 'দ্বিত্বসংখ্যা' ধারণা অভিজ্ঞতানির্ভর; সৃষ্টির পূর্বে এমন জ্ঞান কেবল সর্বজ্ঞ সত্তারই থাকতে পারে। অতএব দ্ব্যণুক-পরিমাণ নির্ধারণে যে দ্বিত্বসংখ্যাজ্ঞান প্রয়োজন, তা ঈশ্বর ব্যতীত কারো পক্ষে সম্ভব নয়— **"দ্ব্যণুকপরিমাণং সংখ্যাজন্যং পরিমাণপ্রচয়াজন্যত্বে সতি জন্য পরিমাণত্বাৎ।"**[8] এই সব যুক্তি দ্বারা উদয়ন প্রমাণ করেন যে ঈশ্বর— নিত্য, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, স্বাধীন চৈতন্য— জগতের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, সংহারকর্তা এবং বেদবাক্যের মূল উপদেষ্টা; তিনিই জীবদের ধর্ম–অধর্ম ও কর্মফল পরিচালনাকারী একমাত্র সত্তা।

---

[6]. তর্কবাগীশ, ফণীভূষণ। *ন্যায়দর্শন (ন্যায়সূত্র ও ভাষ্য, চতুর্থ খণ্ড)*। কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৮, পৃঃ ৪২।

[7]. আচার্য, উদয়ন। *ন্যায়কুসুমাঞ্জলি* শ্রীমোহন ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত। কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৯৫, পৃঃ ৩৭৯।

[8]. সিদ্ধান্ত শিরোমণি, আচার্য বিশ্বেশ্বর। *ন্যায়কুসুমাঞ্জলি* বারাণসী : চৌখম্বা বিদ্যাভবন, ১৯৬২, পৃঃ ১৭২।

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:2(4), February 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

ন্যায়দর্শন মতে ঈশ্বর হলেন জীবাত্মা থেকে ভিন্ন এক নিত্য-মুক্ত, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান আত্মা-বিশেষ, যিনি ক্লেশ-কর্ম-অবিদ্যা-প্রমাদ ইত্যাদি সকল দোষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং জ্ঞান-ইচ্ছা-প্রয়াস-ধর্ম-সমাধি-ঐশ্বর্য প্রভৃতি গুণে বিশেষভাবে সম্বদ্ধ। জগৎ সৃষ্টির জন্য অচেতন পরমাণুদের প্রথম গতি ও সংযোগের প্রয়োজন হয়; আর জড় পরমাণু চৈতন্যের সাহায্য ছাড়া কখনোই কার্য উৎপন্ন করতে পারে না— এই যুক্তি থেকে ন্যায় মতে ঈশ্বরকে জগতের নিমিত্ত কারণ হিসেবে স্থাপন করা হয়। জীবাত্মা শরীরনির্ভর জ্ঞান ও সীমাবদ্ধতার কারণে জগতের উৎপাদক হতে পারে না; তাই নিত্যবুদ্ধি-সমন্বিত এক বিশেষ আত্মাই ঈশ্বর এই কার্য সম্পাদন করেন, এবং শরীর না থাকলেও তাঁর সর্বজ্ঞ-নিত্য-অবাধ জ্ঞান ইন্দ্রিয়বিহীনভাবেই কার্যকর হয়। ন্যায়ে ঈশ্বর সগুণ, কারণ তিনি দেহহীন হলেও জ্ঞান-ইচ্ছা-প্রয়াস ইত্যাদি কৃতিত্বসূচক গুণের অধিকারী; এবং এসব গুণের নিত্যতা-অনিত্যতার দ্বারা আত্মার জাতিভেদ হয় না। ঈশ্বর এক এবং সর্বব্যাপী; তাঁর বিশেষত্ব তিনটি লোকের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের পরিচালনা এবং বেদের প্রণেতা বা উপদেশক হওয়ার মধ্য দিয়ে প্রতিপন্ন হয়। ন্যায় মতে বেদের প্রামাণ্য ঈশ্বরের আপ্তত্বের উপর নির্ভরশীল, কারণ মনুষ্যের নিত্য-অদোষযুক্ত জ্ঞান সম্ভব নয়। জগৎ-কার্য যেমন কুম্ভকারের জ্ঞাত-ইচ্ছিত-প্রয়াসজ উৎপাদন, তেমনি সমগ্র বিশ্বরূপ কার্যও এক সর্বজ্ঞ কৃতার সৃষ্ট— এ অনুমান থেকে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। যদিও ঈশ্বর শরীরহীন, তবুও 'কর্তা' হওয়ার জন্য শরীর অপরিহার্য নয়; কারণ কর্তৃত্বের মূল লক্ষণ ইচ্ছা-প্রয়াস-কার্যসামর্থ্য, যা নিত্যচৈতন্য ঈশ্বরে পূর্ণভাবে বিদ্যমান। এইভাবে ন্যায়দর্শনে ঈশ্বরকে নিত্য-মুক্ত, সর্বজ্ঞ, সগুণ, এক ও আপ্ত জগৎ-স্রষ্টা হিসেবে নির্ণয় করা হয়েছে।

আস্তিক ন্যায়দর্শনে ঈশ্বরকে করুণাময়, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, নিত্য ও দোষবর্জিত সত্তা হিসেবে স্বীকার করা হলেও তিনি কোনো বস্তুর স্বভাব পরিবর্তন করেন না; তাই অধর্ম, দুঃখ বা নাশবান্‌বস্তুর নিত্যতা সাধন ঈশ্বরের দ্বারা সম্ভব নয়। জীবের সঞ্চিত 'অদৃষ্ট' বা কর্মফলকে অতিক্রম না করেই ঈশ্বর জগতের বিধান করেন। যেমন ন্যায়াধীশ কারুণিক হলেও অপরাধ অনুসারে দণ্ড দেন। জগতের বৈচিত্র্যের মূল কারণ সুখ–দুঃখ, আর তা পূর্বকর্মজাত 'অদৃষ্ট' হিসেবে থাকে; কর্ম নষ্ট হলেও তার শক্তি অদৃষ্টরূপে অব্যাহত থাকে এবং সময়ানুগ ফল দেয়। অচেতন অদৃষ্ট নিজে ফল দিতে পারে না; তাই যেভাবে কাঠ কাটতে কুঠারের সঙ্গে চৈতন্যসম্পন্ন কাঠুরের প্রয়োজন হয়, তেমনি অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতা হিসেবে ঈশ্বর আবশ্যক। বিভু-পদার্থ (আকাশ-কাল ইত্যাদি) যেমন পরোক্ষভাবে সংযুক্ত হতে পারে, তেমনি ঈশ্বরও জীব-মন-সংযোগের মাধ্যমে জীবের অধিষ্ঠাতা হন। ঈশ্বর শরীরী নন, কারণ তাঁর জ্ঞান, ইচ্ছা, প্রচেষ্টা ইত্যাদি নিত্য; শরীরের প্রয়োজন কেবল জীবের অনিত্য জ্ঞান-উৎপত্তির জন্যই। তাই ন্যায় মতে ঈশ্বর অব শরীরী, অথচ নিত্য-জ্ঞানধারী। ঈশ্বর ও জীব উভয়েই আত্মা হলেও ঈশ্বর তৃতীয় প্রকারের আত্মা—কারণ তিনি না বদ্ধ, না মুক্ত; তাঁর কোনো ক্লেশ, মিথ্যাজ্ঞান বা দোষ নেই, আবার তাঁর সংকল্পরূপ নিত্যকর্ম থেকে অণিমা-মহিমা প্রভৃতি ঐশ্বর্য জন্মায়, যার দ্বারা তিনি ইচ্ছামাত্রে জগত সৃষ্টি ও পরিচালনা করেন। জীব বহু, সীমাবদ্ধ, শরীরী, সুখ–দুঃখাধীন, অল্পজ্ঞ ও পরতন্ত্র; ঈশ্বর এক, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, নিত্য, নিদোষ, স্বাধীন ও নৈতিকভাবে পরিপূর্ণ। তিনি জীবের কর্মফলপ্রদাতা, রক্ষক ও বিশ্বনিয়ন্তা— যেমন জ্ঞানী পিতা সন্তানের স্বভাব ও যোগ্যানুযায়ী কর্মবিভাগ করেন। এইভাবে ন্যায়দর্শনে ঈশ্বরকে অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতা, জগতের স্রষ্টা–নিয়ন্তা এবং জীব থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, নিত্য-সত্তোগুণময় সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

তাহলে এক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে, ঈশ্বরের এ জ্ঞান ইচ্ছা যদি নিত্যই হয় তবে প্রলয়কালে তাঁর জ্ঞান ও ইচ্ছা কিভাবে বিদ্যমান থাকে? জয়ন্ত ভট্ট ঈশ্বরের জ্ঞান ও ইচ্ছার নিত্যত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বলেন, ঈশ্বরের জ্ঞান যদি অনিত্য হয় তবে সৃষ্টির কোনো এক মুহূর্তে তাঁকে জ্ঞানহীন স্বীকার করতে হয়, যার ফলে জীবের কর্মফলভোগ অসম্ভব হয়ে পড়ে। কেননা জীবের কর্মফল সবসময়ই ঈশ্বরের ইচ্ছায় পরিচালিত হয়। অতএব ঈশ্বর কখনোই জ্ঞানশূন্য হতে পারেন না বলে তাঁর জ্ঞান নিত্য। একই যুক্তিতে ঈশ্বরের ইচ্ছাও নিত্য, কারণ উৎপন্ন না হলে তার বিনাশও নেই; আত্মার মতোই তা নিত্যসত্তা। সৃষ্টিকালে যে ইচ্ছা প্রকাশ পায় তা নতুন উৎপন্ন নয়—পূর্বসৃষ্টির অভিজ্ঞতা-বশেই ঈশ্বর সৃষ্টি করেন। ইচ্ছাকে ক্রমিক বললে তার পূর্ব-পরত্ব অর্থহীন হয় এবং যুগপৎ বললে ত্রিকালব্যাপী সমস্ত ইচ্ছা একযোগে উদিত হয়ে সকল পদার্থ তৎক্ষণাৎ সৃষ্টি হয়ে যাবে, ফলে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ লুপ্ত হবে, যা যুক্তিবিরুদ্ধ। তাই ঈশ্বরের ইচ্ছা নিত্য হলেও তার বিশেষ প্রকাশ নির্ভর করে আত্মার সঙ্গে মনের সংযোগের উপর। প্রলয়ের সময় এই মনঃসংযোগ না থাকায় শুধু নিত্য ইচ্ছা থাকে কিন্তু বিশেষ প্রকাশ ঘটে না; প্রলয়ের পূর্বমুহূর্তে সংহারসংক্রান্ত ইচ্ছার প্রকাশ এবং যথাসময়ে সৃষ্টিসংক্রান্ত ইচ্ছার ঘনীভবনেই মনঃসংযোগ ঘটিয়ে সৃষ্টি সম্ভব হয়। মাঝের সময়ে জগৎপালনোপযোগী ইচ্ছার প্রকাশ থাকে—এইভাবেই নিত্য-ইচ্ছা বিশেষ-অভিব্যক্তি পায়। বৎস্যায়ন তাঁর ন্যায়সূত্রভাষ্যে বলেছেন— **"সংকল্পানুবিধায়ী চাস্য ধর্মঃ প্রত্যাত্মবৃত্তীন ধর্মাধর্মসঞ্চয়ান্ পৃথিব্যাদীনি চ ভূতানি প্রবর্ত্তয়তি। এবঞ্চ স্বকৃতাভ্যাগমস্যালোপেন নির্মাণ-প্রাকাম্যমীশ্বরস্য স্বকৃত-কর্ম্মফলং বেদিতব্যং।"**[9] এক্ষেত্রে তিনি 'সংকল্পানুবিধায়ী চাস্য ধর্মঃ' বলে ঈশ্বরের সংকল্পের দ্বারা সৃষ্টি-শক্তিকে নির্দেশ করেছেন। সংকল্প যদি ইচ্ছা হয় তবে ইচ্ছাতেই সৃষ্টিযোগ্যতা স্বীকৃত; আর যদি জ্ঞানবিশেষ হয়, তবুও শ্রুতি-সম্মত— যেমন তৈত্তিরীয় উপনিষদের 'সোহকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি' এবং 'স তপোহতপ্যত' বাক্যগুলিতে ঈশ্বরের ইচ্ছা ও জ্ঞান-তপস্যা উভয়ের উল্লেখ আছে; মুণ্ডক উপনিষদের 'যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ'-ও একই কথা বলে। নৈয়ায়িকদের মতে, ঈশ্বরের পূর্বসৃষ্ট জগতের পর্যালোচনাজাত জ্ঞানই তাঁর তপস্যা; সৃষ্টি অনাদি, সংহারও পৌর্বাপর্য রক্ষার জন্য অনাদি। এপ্রসঙ্গে মনুসংহিতায় বলা হয়েছে— **"সংকল্পমূলঃ কামো বৈ।"**[10] অর্থাৎ ঈশ্বরের সংকল্পেই সৃষ্টি-ইচ্ছার উদ্ভব। মেধাতিথি সংকল্পকে ব্যাখ্যা করেছেন 'সৃষ্টির পূর্বে সৃষ্ট-পদার্থসমূহের স্বরূপনিরূপণ' হিসেবে। এই জ্ঞানবিশেষ বা সংকল্পের ফলেই ঈশ্বর সমগ্র জীবের অদৃষ্টসমষ্টি ও জগতের উপাদান-কারণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত হয়ে সৃষ্টিকর্মে প্রবৃত্ত হন, এবং ঐ সংকল্পই অদৃষ্টসমষ্টির মধ্যে এমন এক গতি সৃষ্টি করে যার ফলে উপাদানসমূহ যথাযথভাবে সুশৃঙ্খল রীতিতে সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করে।

---

[9]. তর্কবাগীশ, ফণীভূষণ। *ন্যায়দর্শন (ন্যায়সূত্র ও ভাষ্য, চতুর্থ খণ্ড)*। কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৮, পৃঃ ৭৪।

[10]. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র। *মনুসংহিতা* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৯, পৃঃ ৫৭।

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:2(4), February 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

এখানে মূল প্রশ্ন ওঠে ঈশ্বর যদি মুক্তপুরুষ হন, তবে তাঁর সংকল্পজনিত সৃষ্টিনির্মাণ সম্ভব নয়, কারণ মুক্ত সত্তার কোনো সংকল্প থাকে না; আবার যদি ঈশ্বর বদ্ধ হন, তবে তাঁর ঈশ্বরত্বই নষ্ট হয়ে যায়। ন্যায়ভাষ্য অনুসারে ঈশ্বর বদ্ধ নয় মুক্ত নয়, তিনি উভয় অবস্থা থেকে স্বতন্ত্র; কারণ তাঁর মিথ্যাজ্ঞান নেই, ফলে তিনি বদ্ধ নন, এবং তাঁর সংকল্পজনিত ধর্ম ও অণিমাদি ঐশ্বর্য উৎপন্ন হয় বলে তাঁকে মুক্তও বলা যায় না। ভাষ্যকারের মতে, যার বন্ধন আছে তারই মুক্তির প্রয়োজন, কিন্তু ঈশ্বরের বন্ধন নেই বলেই তাঁকে মুক্তও বলা চলে না— উদ্যোতকর তাঁর ন্যায়বার্তিকেও এই অভিমত সমর্থন করেন। যোগদর্শনে ঈশ্বরকে নিত্যমুক্ত বলা হলেও সাংখ্যকারের মতে 'মুক্ত' এবং 'বদ্ধ'— এই দুইয়ের বাইরে তৃতীয় কোনো পুরুষ কল্পনাযোগ্য নয়, তাই ঈশ্বর নিত্যমুক্তও নন। ন্যায়মঞ্জরীকার জয়ন্ত ভট্ট ন্যায়দর্শনের ঈশ্বর স্বীকৃতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, সৃষ্টির জন্য একজন সর্বজ্ঞ কর্তার প্রয়োজন, যিনি উপাদান কারণসমূহের স্বরূপ ও নির্মাণকৌশল সম্পর্কে অপরোক্ষ জ্ঞানসম্পন্ন। এই সর্বজ্ঞ কর্তাই ঈশ্বর, এবং ন্যায়মতে ঈশ্বর স্বীকৃতির মূল ভিত্তি তাঁর সর্বজ্ঞতা। কিন্তু ঈশ্বর যদি এক মুহূর্তেও জ্ঞানহীন হন তবে সেই ক্ষণে জগতের ব্যাপক বিলোপ ঘটবে; আবার প্রলয়কালে ঈশ্বরের জ্ঞান অব্যাহত থাকলে তাঁর ইচ্ছাও অব্যাহত থেকে জগতের প্রবাহ বন্ধ হবে না— ফলে ন্যায়সম্মত প্রলয় অসম্ভব হয়ে পড়বে। এই সংকট নিরসনে জয়ন্ত ভট্ট বলেন, প্রলয়ের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত ঈশ্বরের জ্ঞান বিদ্যমান থাকে, এবং প্রলয়কালে তাঁর জ্ঞানের বিনাশের কোনো কারণ নেই। যেহেতু আত্মার মতো ঈশ্বরের জ্ঞানও নিত্য, তাই তার বিনাশ অচিন্তনীয়। ফলে পুনঃসৃষ্টির সময় ঈশ্বরের জ্ঞানের নতুন উৎপত্তির প্রয়োজন পড়ে না। আরও বলেন, ঈশ্বরের জ্ঞান না ক্রমিক, না যুগপৎ— ক্রমিক হলে অনাগত বিষয়ের জ্ঞান থাকবে না, যা সর্বজ্ঞতার পরিপন্থী; যুগপৎ হলে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ পৃথক বলা যায় না। তাই ঈশ্বরের জ্ঞান সর্বদাই সমভাবাপন্ন। নিত্যজ্ঞান হওয়ায় তা ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষজাত নয়, পরোক্ষও নয়— এটি এক বিশেষ অপরোক্ষ জ্ঞান, যা প্রত্যক্ষের সমজাতীয়। জ্ঞান নিত্য বলে ঈশ্বরের ইচ্ছা ও প্রযত্নও নিত্য; কারণ যদি এগুলি মনঃসংযোগনির্ভর হতো তবে অনিত্য হতো। কিন্তু ইচ্ছা ও প্রযত্ন নিত্য হলে প্রতিক্ষণে নতুন জগতের সৃষ্টি ও সংহার ঘটত, যা অসম্ভব; সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের ক্রমিকতা শাস্ত্রসম্মত। এই অসংগতির উত্তরে জয়ন্ত ভট্ট বলেন, ঈশ্বরের ইচ্ছা নিত্য হলেও কার্যকর হতে হলে অনাত্ম বস্তুসমূহের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক প্রয়োজন, ইচ্ছার বিশেষ উদ্রেক না ঘটলে সৃষ্টি বা সংহার বাস্তবায়িত হয় না। তাই সৃষ্টি-সংহার মাঝের সময়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ের প্রতি অনুরক্ত নয়, কেবল স্বরূপভাবে থাকে; যখন বিশেষ উদ্দেশ্যে ইচ্ছার স্ফুরণ ঘটে, তখনই সৃষ্টি বা সংহার কার্যকর হয়। এভাবে ঈশ্বরের নিত্য ইচ্ছা থেকেও সৃষ্টি-সংহারের ক্রম নষ্ট হয় না। কিন্তু ঈশ্বরের সর্বকর্তৃত্ব মেনে নিলে জগতের সুখদুঃখও ঈশ্বরসৃষ্ট বলে স্বীকার করতে হয়। সুখ তৃপ্তিকর হলেও দুঃখ ক্লেশদায়ক। অতএব ঈশ্বর জীবের দুঃখ সৃষ্টি করে বিদ্বেষ প্রদর্শন করেছেন, যা তাঁর নিত্যশুদ্ধতা ও সর্বজ্ঞতার বিরোধী। সর্বজ্ঞ ঈশ্বর নিশ্চয়ই দুঃখের অনিষ্টফল জানেন, তাই দুঃখসৃষ্টি তাঁকে পক্ষপাতদুষ্ট ও অশুদ্ধ প্রতিপন্ন করে। অথচ শাস্ত্রমতে ঈশ্বর করুণাময় ও নিরপেক্ষ— এই দুইয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব স্পষ্ট। যদি ঈশ্বর রাগদ্বেষহীন নিত্য মুক্তপুরুষ হন, তবে তিনি দুঃখের উপযোগী অবস্থা সৃষ্টি করতেন না। অতএব এই যুক্তি অনুসারে ঈশ্বরের নিত্যমুক্ততা ও নিত্যসর্বজ্ঞতাও প্রশ্নের মুখে পড়ে।

জয়ন্ত ভট্ট ন্যায়মঞ্জরীতে ঈশ্বর-সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কিত সমস্যার সমাধানে বলেন যে, ঈশ্বর কেন জগৎ সৃষ্টি করেন—এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজা বৃথা; কারণ সূর্যের আলোকদান যেমন স্বভাবসিদ্ধ, তেমনই ঈশ্বরের সৃষ্টি ও সংহার তাঁর স্বভাবমাত্র। ঈশ্বরের জগৎসৃষ্টি তাই একপ্রকার ক্রীড়া— শিশু যেমন স্বভাবতই ঘর বানায় ও ভাঙে, ঈশ্বরও নিরাসক্ত চিত্তে সৃষ্টি ও সংহারে প্রবৃত্ত হন। বেদান্ত সূত্রকারও জগৎকে ঈশ্বরের 'লীলা' বলেছেন, যদিও শংকরাচার্য ব্যাখ্যা করেন যে 'লীলা' কোনো তৃপ্তি বা ফললাভের জন্য নয়। যেমন মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাস স্বভাবজাত, তেমনই ঈশ্বরের সৃষ্টিও তাঁর স্বভাববশত ঘটে। তাই ঈশ্বরকে দোষারোপের প্রশ্ন আসে না। নৈয়ায়িক অবিদ্ধকর্ণপাদ ঈশ্বর-সিদ্ধির দুটি যুক্তি দেন— প্রথমত, জগৎ সাবয়ব এবং বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণবিশিষ্ট, তাই এর একটি বুদ্ধিমান কর্তা থাকা আবশ্যক। দ্বিতীয়ত, অচেতন পরমাণুসমূহ চেতন কর্তার প্রযত্ন ছাড়া কোনো কার্য সৃষ্টি করতে পারে না, যেমন তন্ত্রগুলো তন্তুবায়ের চেষ্টায় বস্ত্ররূপ পায়। তিনি আরও যুক্তি দেন যে জগতে বস্তু ব্যবহারের জ্ঞান আদিমমানব আকস্মিকভাবে পেতে পারে না; তাই অবশ্যই কোনো সর্বজ্ঞ কর্তাই জীবকে ব্যবহার পদ্ধতি শেখান— তিনি ঈশ্বর। কিন্তু বৌদ্ধ দার্শনিকেরা এসব যুক্তি খণ্ডন করে বলেন, অবয়ব-সন্নিবেশের ধারণাই অসিদ্ধ, তাই স্বয়ং সাবয়ব বস্তুও প্রতিষ্ঠিত নয়; উপরন্তু দৃষ্টান্তে অনিত্য কার্য থেকে নিত্য কর্তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ যুক্তিসিদ্ধ নয়। তাঁদের মতে নির্মাতার জ্ঞান অনিত্যই হতে পারে, তাই নিত্যসর্বজ্ঞ ঈশ্বর প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। বরং সাধনার ফলে বুদ্ধদেবের মতো ব্যক্তিও সর্বজ্ঞ হতে পারেন, কিন্তু তিনি নিত্য নন। বৌদ্ধগণ প্রতিপক্ষের যুক্তি নিজেরাই উদ্ধৃত করে তা বিশ্লেষণ ও খণ্ডন করেছেন, ফলে ঈশ্বরসিদ্ধ নৈয়ায়িক যুক্তিগুলোর ভিত্তি কতটুকু টেকে তা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে।

ন্যায়মতে, যেমন একটি ঘট তৈরি করতে কুমোরের মতো দক্ষ কর্তার প্রয়োজন হয়, তেমনি এই বিশাল জগতের সৃষ্টির জন্যও একজন সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান কর্তা থাকা উচিত— তাঁকেই ঈশ্বর বলা হয়। কিন্তু সমস্যাটি হলো ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষভাবে পাওয়া যায় না; ফলে শুধুমাত্র অনুমানের মাধ্যমে অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরকে প্রতিষ্ঠা করা কঠিন। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কৃত্রিম জিনিসের স্রষ্টা অনুমান করা গেলেও প্রাকৃতিক জগতের পেছনে অতীন্দ্রিয় স্রষ্টা অনুমান করা সহজ নয়। 'ঘট কুমোরের সৃষ্টি' এই দৃষ্টান্ত থেকে সমগ্র জগতের স্রষ্টা ঈশ্বর এমন ব্যাপক সিদ্ধান্ত যুক্তিপূর্ণ হয় না।

বৌদ্ধ দার্শনিক ধর্মকীর্তি দেখিয়েছেন, যা মাটি দিয়ে তৈরি তাই কুমোরের সৃষ্টি— এই সাধারণসূত্র ধরে উইয়ের ঢিবিও কুমোরের তৈরি বলা যেমন অযৌক্তিক, তেমনি কার্যমাত্রের কর্তা আছেন বলে জগৎকর্তা ঈশ্বরও আছেন— এই অনুমানও ভিত্তিহীন। সুতরাং সাধারণ দৃষ্টান্তের সাহায্যে সমগ্র বিশ্বসৃষ্টির পেছনে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব প্রমাণ করা নৈয়ায়িকদের পক্ষে যুক্তিগতভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে।

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:2(4), February 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

ন্যায়সূত্র, ভাষ্য এবং ন্যায়বার্তিকে— এই তিন পর্যায়ের আলোচনাতেই ঈশ্বরকে জগৎকর্তা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে, কারণ ন্যায়শাস্ত্রে কার্যসাধনের জন্য যে তিনটি উপাদান— জ্ঞান, চিকীর্ষা (ইচ্ছা) ও প্রযত্ন অপরিহার্য, তাদের সমবায়কেই কর্তার লক্ষণ বলা হয়। ন্যায়বার্তিককারও বলেছেন— **"জ্ঞানচিকীর্ষাপ্রযত্নানাং সমবায়ঃ কর্তৃত্বমিতি।"**[11] তাই ঈশ্বরকে জগৎকর্তা মানতে হলে তাঁর মধ্যেও এই তিন বিশেষগুণের স্বীকৃতি দিতে হয়, এবং আরও পাঁচটি সামান্যগুণ যোগ হয়ে ঈশ্বরের মোট আটটি গুণ নির্ধারিত হয়। টীকাকার বাচস্পতি মিশ্রও এই আটটি গুণ স্বীকার করে বলেছেন—**"বুদ্ধিবদিচ্ছাপ্রযত্নৌ অপি তস্য নিত্যৌ সকর্তৃকত্বসাধনান্তর্গতৌ বেদিতব্যৌ।"**[12] অর্থাৎ ঈশ্বরের জ্ঞান যেমন নিত্য, তেমনই তাঁর ইচ্ছা ও প্রযত্নও নিত্য, এবং এই তিনটির সমবায়েই ঈশ্বরের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ভাষ্যকার যেখানে ঈশ্বরের ধর্ম, জ্ঞান, সমাধিসম্পদ ও অণিমাদি অষ্টঐশ্বর্য আরোপ করেছেন, বার্তিককার সেখানে আপত্তি তুলে বলেন যে ঈশ্বরের জ্ঞানরূপ বিশেষগুণের প্রমাণ থাকলেও ধর্মাদি আরোপের কোনো প্রমাণ নেই। তাই ভাষ্যকারের অভিমত গ্রহণযোগ্য নয়। তাৎপর্যটীকাকারও ভাষ্যকারের বক্তব্যকে পরমার্থ বক্তব্য নয়, বরং অভ্যুপগমবাদ বলেই ব্যাখ্যা করেন। ঈশ্বরের প্রকৃত গুণনির্ণয়ে প্রথম সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত বার্তিককারই স্থাপন করেন, এবং কারিকাবলী গ্রন্থেও প্রাচীন সংগ্রহ-শ্লোকের ভিত্তিতে ঈশ্বরের ৮টি গুণ ন্যায়বার্তিক ও তাৎপর্যটীকার অনুসারে স্বীকৃত। তবে লক্ষণীয় যে বার্তিককার প্রযত্ন স্বীকার না করে ঈশ্বরের মাত্র ৭টি গুণ মেনে নেন; তাঁর মতে অশরীরী ঈশ্বরের ক্ষেত্রে প্রযত্নের প্রয়োজন নেই, অপ্রতিহত ইচ্ছাশক্তিই জীবের ধর্ম–অধর্ম এবং পরমাণুর গতি-নিয়ন্ত্রক। অন্যদিকে বাচস্পতি মিশ্র, উদয়নাচার্য ও পরবর্তী নৈয়ায়িকগণ ঈশ্বরের নিত্য প্রযত্ন স্বীকার করে মোট ৮টি গুণ গ্রহণ করেছেন। বার্তিককারের ভাষায়, যেমন বিষবিভাবিত ব্যক্তি স্বীয় ইচ্ছাশক্তি দ্বারা দেহস্থিত বিষে ক্রিয়া উৎপাদন করে বিষকে অপসারণ করেন, তেমনই ঈশ্বরও স্বীয় অপ্রতিহত ইচ্ছাশক্তি দ্বারা জগতের সৃষ্টি-সংহার ও জীব-পরমাণুর প্রবৃত্তি–নিবৃত্তি ঘটান, যেখানে প্রযত্নের আলাদা প্রয়োজন নেই।

জয়ন্ত ভট্ট ন্যায়মঞ্জরীর প্রমাণপ্রকরণে বলেছেন— **"তদেবং নবভ্য আত্মগুণেভ্যঃ পঞ্চ জ্ঞানমুখেচ্ছাপ্রযত্নধর্মাঃ সন্তি ঈশ্বরে। চত্বারস্তু দুঃখদ্বেষাধর্মসংস্কারাঃ ন সন্তি। ইতি আত্মবিশেষ এব ঈশ্বরো ন দ্রব্যান্তরম্।"**[13] এর মর্মার্থ এই যে, আত্মার নয়টি বিশেষগুণের মধ্যে জ্ঞান, সুখ, ইচ্ছা, প্রযত্ন ও ধর্ম—এই পাঁচটি গুণ ঈশ্বরের অন্তর্গত; কিন্তু দুঃখ, দ্বেষ, অধর্ম ও সংস্কার—এই চারটি গুণ জীবাত্মায় থাকলেও ঈশ্বরে নেই। সুতরাং ঈশ্বর কোনো পৃথক দ্রব্য নন, তিনি আত্মারই এক বিশেষরূপ (আত্মবিশেষ)। জয়ন্ত ভট্টের মতে ঈশ্বরের পাঁচটি বিশেষগুণের সঙ্গে আত্মার পাঁচটি সাধারণ গুণ যুক্ত হয়ে তিনি দশগুণবিশিষ্ট সত্তা। এছাড়া তিনি ঈশ্বরের আনন্দরূপ গুণও স্বীকার করেছেন— **"স দেবঃ পরমো জ্ঞাতা নিত্যানন্দকৃপান্বিতঃ।"**[14] এইভাবে ঈশ্বরের ধর্মও তিনি স্বীকার করায় তিনি ন্যায়ভাষ্যকারের মত অনুসরণ করেছেন; কিন্তু বার্ত্তিককার এই মত প্রত্যাখ্যান করেন। বার্ত্তিককারের প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও জয়ন্ত ভট্ট ধর্মকে ঈশ্বরগুণ হিসেবে গ্রহণ করায় তিনি বার্ত্তিককারের অনুগামী নন; তাই তিনি নৈয়ায়িকদের মধ্যে একদেশী নৈয়ায়িক হিসেবে পরিচিত। অন্যদিকে বার্ত্তিককারের মত গ্রহণ করায় বাচস্পতি, উদয়ন প্রভৃতি আচার্য মূল ন্যায়প্রস্থানে পরিগণিত হয়েছেন।

ঈশ্বরের আনন্দস্বীকার কাশ্মীরীয় ন্যায়প্রস্থানের ঐতিহ্যানুযায়ী। কাশ্মীরীয় ন্যায়প্রবর্তক ভাসর্বজ্ঞ তাঁর ন্যায়সারে মোক্ষকে ঈশ্বরভাবাপত্তি বলেছেন এবং মোক্ষের সঙ্গে সুখসত্তা যুক্ত বলে নির্দেশ করেছেন; সেই কারণেই ঈশ্বরে আনন্দসত্তা কাশ্মীরীয় ন্যায়ধারার অনুমত। জয়ন্ত ভট্ট কাশ্মীরের বাসিন্দা হওয়ায় তাঁর এই মতপ্রবণতা স্বাভাবিক; কাশ্মীরীয় ন্যায়ধারা আবার শৈবসিদ্ধান্ত দ্বারা প্রভাবিত। ঈশ্বরের প্রযত্ন সম্পর্কে জয়ন্ত ভট্টের গুরুত্বপূর্ণ অভিমত— **"প্রযত্নস্তস্য সংকল্পবিশেষাত্মক এব।"**[15] তিনি শ্রুতির উদ্ধৃতি দেন— **"সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ। কাম ইতি ইচ্ছা উচ্যতে। সংকল্প ইতি প্রযত্নঃ।"**[16] এর দ্বারা তিনি দেখিয়েছেন যে ঈশ্বরের প্রযত্ন কৃতিরূপ নয়, বরং সংকল্পবিশেষ; শ্রুতির 'সত্যসংকল্প' শব্দের অর্থই তিনি প্রযত্নরূপে গ্রহণ করেছেন। ফলে প্রযত্ন সম্পর্কে তাঁর মত প্রচলিত ন্যায়ধারার সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এই প্রসঙ্গে একটি বিশেষ বিষয় লক্ষ্যণীয়— জীবের ইচ্ছা বা সংকল্প অনুসারে যেমন অচেতন শরীরে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, তেমনি ঈশ্বরের ইচ্ছা বা সংকল্প অনুসারেও অচেতন পরমাণুতে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। জয়ন্ত ভট্ট স্পষ্টভাবে বলেছেন— **"যথা হ্যচেতনঃ কায় আত্মেচ্ছামনুবর্ততে। তদিচ্ছামনুবর্তস্যন্তে তথৈব পরমাণবঃ।।"**[17] অর্থাৎ আত্মার ইচ্ছায় অচেতন শরীরে যেমন ক্রিয়া ঘটে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় তদ্রূপ অচেতন পরমাণুতেও ক্রিয়া জন্মায়। এর ফলে পরমাণুগুলিকে ঈশ্বরের শরীরস্থানীয় বলা যায়— এই ধারণাটি জয়ন্ত ভট্ট পরোক্ষে প্রকাশ করেছেন। ঈশ্বরের প্রযত্ন স্বীকারকারী আচার্যদের মতে, যেহেতু প্রযত্নের ফলশ্রুত ক্রিয়া শরীরেই উৎপন্ন হয়, আর ঈশ্বরপ্রযত্নজাত ক্রিয়া যদি পরমাণুতে উৎপন্ন হয়, তবে পরমাণুগুলিই ঈশ্বরের শরীর। উদয়নাচার্য কুসুমাঞ্জলিতে এই কথাই সুস্পষ্টভাবে লিখেছেন— **"সাক্ষাৎ অধিষ্ঠাতরি সাধ্যে পরমাণ্বাদীনাং শরীরত্বপ্রসঙ্গ ইতি কিমিদং শরীরত্বং যৎ প্রসজ্যতে? যদি সাক্ষাৎ প্রযত্নবদধিষ্ঠেয়ত্বং তদিষ্যত এব।"**[18] অর্থাৎ, যদি

---

[11]. ঠাকুর, অনন্তলাল। *ন্যায়বার্তিকতাৎপর্যটীকা* নিউ দিল্লি : আই. সি. পি. আর, ১৯৯৬, পৃঃ ৪৬৫।

[12]. তদেব, পৃঃ ৫৬৮।

[13]. Varadacharya, K. S. *Nyāyamañjarī (Vol. 1).* Mysore : Oriental Institute, 1969, pp. 184–185.

[14]. IBID, P. 175.

[15]. বাগচী, যোগেন্দ্রনাথ। *বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ও দার্শনিকতত্ত্ব* কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৬৫, পৃঃ ৯০।

[16]. তদেব।

[17]. শাস্ত্রী, গৌরীনাথ। *ন্যায়মঞ্জরী* বারাণসী : সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮২, পৃঃ ২৮৪।

[18]. আচার্য, উদয়ন। *ন্যায়কুসুমাঞ্জলি* শ্রীমোহন ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত। কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৯৫, পৃঃ ৩৯০।

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:2(4), February 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

পরমাণু ঈশ্বরের সরাসরি প্রযত্নাধিষ্ঠেয় হয়, তবে তাদের ঈশ্বর-শরীরত্ব মানতেই হবে—এমন আপত্তির উত্তরে উদয়ন বলেন, যদি শরীরত্ব বলতে সরাসরি প্রযত্নাধিষ্ঠেয়ত্ব বোঝানো হয়, তবে পরমাণুর ঈশ্বর-শরীরত্ব তিনি স্বীকার করেন।

এভাবে দেখা যায়— জয়ন্ত ভট্ট যে মতটি সূচিত করেছিলেন, উদয়ন তা স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন; এবং যখন পরমাণু ঈশ্বর-শরীররূপে স্বীকৃত হয়, তখন ঈশ্বর ও জগতের সম্পর্ক শরীর-শরীরিভাব হয়ে দাঁড়ায়— যা রামানুজের ঈশ্বরাদ্বৈত দর্শনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

মহর্ষি বাত্স্যায়ন বলেছেন— **"পুরুষোয়ং সমীহমানো নাবশ্যং সমীহাফলং প্রাপ্নোতি। তেনানুমীয়তে— 'পরাধীনং পুরুষস্য কর্মফলারাধনমিতি, যদধীনং স ঈশ্বরঃ। তস্মাদীশ্বরঃ কারণমিতি।'"**[19] অর্থাৎ, এই পুরুষ চেষ্টা করলেও সর্বদা তার চেষ্টার অনুরূপ ফল লাভ করে না। সুতরাং অনুমান করা হয়, পুরুষের কর্মফল তার নিজের অধীন নয়; যে সত্তার অধীন সেই কর্মফল, তিনিই ঈশ্বর। অতএব ঈশ্বরই কারণ।

এই সকল গুণে ভূষিত হওয়ার কারণেই তাঁকে 'পুরুষোত্তম' বলা হয়। কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে জীব স্বাধীন, কিন্তু সেই কর্মের উপযুক্ত ফল দান ঈশ্বরের হাতে। অতএব তিনিই ফলদাতা। ফলে ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, তিনি জীবের সমস্ত কর্ম সম্পর্কে অবগত। এই প্রসঙ্গে বাত্স্যায়নের উক্তি— **"পুরুষকারমীশ্বরোঽনুগৃহ্লাতি ফলায় পুরুষস্য যতমানস্য ঈশ্বরঃ ফলং সম্পাদয়তি।"**[20] অর্থাৎ, ঈশ্বর কর্মে প্রবৃত্ত পুরুষকে ফল লাভের জন্য অনুগ্রহ করেন; চেষ্টারত জীবের জন্য ঈশ্বরই ফল সম্পাদন করেন।

এতটুকুই নয়, ঈশ্বর নিজে ফলপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে পরিশ্রমরত পুরুষের সহায়ক হন এবং ফলদানে কৃপা বর্ষণ করেন। যখন চেষ্টা সত্ত্বেও জীব অনুকূল ফল লাভ করে না, তখন বুঝতে হবে সেই জীবের উপর ঈশ্বরের কৃপা বর্তমান নেই। ঈশ্বরে ধর্ম ও সমাধিজাত ফলস্বরূপ অণিমা, গরিমা, লঘিমা প্রভৃতি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য বিদ্যমান, যা জীবের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। ঈশ্বর জীবের সংকল্প অনুযায়ী কর্ম করা বা না-করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ সক্ষম। তিনি প্রত্যেক আত্মায় অবস্থানকারী ধর্ম ও অধর্মকে পৃথিবী প্রভৃতি ভৌতিক তত্ত্বে প্রবৃত্ত করান— **"প্রত্যাত্মবৃত্তীন্ ধর্মাধর্মসঞ্চয়ান্ পৃথিব্যাদীনি চ ভূতানি প্রবর্তয়তি।"**[21]

বাস্তবিকপক্ষে, জগৎ নির্মাণের কারণও জীবকৃত কর্মফলকেই বলা উচিত। ঈশ্বর আপ্তকাম ও আপ্তকল্প। যেমন পিতা নিঃস্বার্থভাবে পুত্রের কল্যাণে অনুগ্রহ করে থাকেন, তেমনি ঈশ্বরও বিশ্বস্থিত সকল প্রাণীর প্রতি নিরন্তর অনুগ্রহ করেন। তবে তিনি অনুগ্রহ করেন তাদের প্রতিই, যারা তাঁর নির্দেশ অনুসারে চলে।

'তার্কিকরক্ষা' গ্রন্থের প্রণেতা আচার্য বরদরাজ তাঁর গ্রন্থারম্ভে নিম্নলিখিত শ্লোকের দ্বারা পরমাত্মাকে প্রমাণ করেছেন— **"নমামি পরমাত্মানং স্বতঃ সর্বার্থ বেদিনম্। বিদ্যানামাদিকর্তারং নিমিত্তং জগতামপি॥"**[22] আত্মত্ব জাতি ও জ্ঞান গুণ— এই দুটি আত্মার প্রসিদ্ধ লক্ষণ ঈশ্বরের মধ্যেও বিদ্যমান। অতএব ঈশ্বরকে বিস্মৃত করা অনুচিত। সিদ্ধান্তমুক্তাবলী গ্রন্থে বিশ্বনাথ পঞ্চানন স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন যে, আত্মত্ব-জাতি জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ের মধ্যেই বর্তমান। অর্থাৎ তাঁর মতে আত্মত্ব কোনো একান্তভাবে জীবাত্মা-নির্দিষ্ট জাতি নয়, বরং ঈশ্বরেও তার প্রযোজ্যতা রয়েছে। কিন্তু অপরদিকে, রঘুনাথ শিরোমণির দীধিতি টীকার মঙ্গলাচরণে ব্যবহৃত 'পরমাত্মনে' শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নব্যনৈয়ায়িক গদাধর ভট্টাচার্য একটি ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তাঁর মতে, 'আত্মন' শব্দ মূলত জ্ঞানবিশিষ্ট চেতন সত্তাকেই বোঝায়। এই অর্থে ঈশ্বরকে 'আত্মন' বলা গেলেও, ঈশ্বরে আত্মত্ব-জাতি স্বীকার করা যায় না। অর্থাৎ 'আত্মন' শব্দের প্রয়োগ মানেই সেখানে আত্মত্ব-জাতির অবস্থিতি— এমনটি তিনি মানেন না। তবে লক্ষণীয় যে, বৈশেষিক দর্শনে পরমাত্মার ক্ষেত্রেও 'আত্মন' শব্দের প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। বিশেষত শ্রীধরাচার্য তাঁর ন্যায়কন্দলী গ্রন্থে 'আত্মা' শব্দের দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়কেই অভিহিত করেছেন। এর দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, বৈশেষিক পরম্পরায় 'আত্মা' শব্দটি কেবল জীবাত্মার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং ঈশ্বরকেও তার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

কোনো কার্যের কর্তা হতে হলে সেই কার্যের কারণসমূহের জ্ঞান, কার্য সম্পাদনের ইচ্ছা এবং সেই কার্য সাধনে প্রযত্ন আবশ্যক। অতএব ঈশ্বরকে জগতের কর্তা হিসেবে মানতে হলে তাঁর মধ্যে জগতের কারণসম্বন্ধে জ্ঞান, জগত সৃষ্টির ইচ্ছা এবং সৃষ্টির জন্য প্রযত্ন— এই তিনটির অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। জীবাত্মার ক্ষেত্রে জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রযত্নের উদয় শরীরের সঙ্গে সম্পর্কের মাধ্যমে ঘটে, এবং শরীরের সম্পর্ক পূর্বকর্মের ফলভোগের জন্য। কিন্তু ঈশ্বরের কোনো পূর্বকর্ম নেই, যার ফলভোগের জন্য তাঁর শরীরধারণ প্রয়োজন হবে। সুতরাং শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলেও ঈশ্বরে জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রযত্ন নিত্যরূপে বিদ্যমান। অতএব ঈশ্বরই সমগ্র জগতের কর্তা এবং তাঁর এই গুণসমূহ সর্ববিষয়ক।

বাক্যরচনার জন্য বাক্যার্থের জ্ঞান প্রয়োজন। ঈশ্বর সমগ্র বেদের রচয়িতা, অতএব তাঁকে সমগ্র বেদের অর্থজ্ঞ মানা হয়। তিনি সকল জীবের শুভ-অশুভ কর্মের অধিষ্ঠাতা, তাই তিনি সকল জীবের সমস্ত কর্মের জ্ঞাতা। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ— এই চার পুরুষার্থ লাভে তিনি মানুষের সহায়ক। তাঁর সহায়তা ও কৃপা ব্যতীত মানুষ কিছুই করতে পারে না; তাই তিনি মানুষের উপাস্য। 'ন্যায়কুসুমাঞ্জলি' গ্রন্থে উদয়নাচার্য এই কথাই ইঙ্গিত করে বলেছেন— **"স্বর্গাপবর্গয়োর্মার্গমামনন্তি মনীষিণঃ। যদুপাস্তিমসাবত্র পরমাত্মা নিরূপ্যতে॥"**[23] ঋগ্বেদে বর্ণিত হয়েছে— একই বৃক্ষে দুটি পক্ষী অবস্থান করছে। তারা পরস্পরের বন্ধু ও সহযোগী। এক পক্ষী বৃক্ষের সুস্বাদু ফল ভোগ করে, আর অপর পক্ষী ফল ভোগ

19. শাস্ত্রী, দ্বারিকাদাস। *ন্যায়ভাষ্যম্*। বারাণসী : বৌদ্ধভারতী, ১৯৯৮, পৃঃ ৩৫৩।
20. তদেব, পৃঃ ৩৫৪।
21. তদেব।
22. শ্রীবাস্তব, ড. বিজয়। *তার্কিকরক্ষা* বারাণসী : কলা প্রকাশন, ২০০৯, পৃঃ ২৬৩।
23. আচার্য, উদয়ন। *ন্যায়কুসুমাঞ্জলি* শ্রীমোহন ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত। কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৯৫, পৃঃ ৪।

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:2(4), February 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

না করে কেবল ভোক্তা পক্ষীর সাক্ষী ও সহায়ক রূপে বিরাজমান থাকে। প্রাণীর শরীরে পরমেশ্বরের অবস্থানের কথা ভগবদ্গীতাতেও এইভাবে বলা হয়েছে— **"ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢানি মায়য়া॥"**[24] অর্থাৎ, ঈশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থান করেন এবং মায়ার দ্বারা যন্ত্রে আরূঢ় জীবসমূহকে তাদের কর্মানুসারে বিভিন্ন কর্মে প্রবৃত্ত করান।

পরমাত্মার মধ্যে অষ্টগুণের অধিষ্ঠান স্বীকার করা হয়। জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রযত্ন— এই তিনটি বিশেষ গুণ; এবং সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ ও বিভাগ— এই পাঁচটি সামান্য গুণ। পরমাত্মা সংখ্যায় এক এবং পরিমাণে পরম মহৎ। তাঁর জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রযত্ন নিত্য এবং সর্ববিষয়ক।

প্রশ্ন হলো যদি ঈশ্বরের জ্ঞান সর্ববিষয়ক হয়, তবে মানুষের ভ্রমজ্ঞানও তাঁর জ্ঞানের বিষয় হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে ঈশ্বরও কি ভ্রান্ত জ্ঞানে পতিত হন না? কারণ, যে জ্ঞান অন্য একটি জ্ঞানকে বিষয় করে, সে সেই জ্ঞানের বিষয়বস্তুকে যথাযথভাবে অবগাহন করে। যেমন— 'হরিদাস অল্প অন্ধকারে রজ্জু দেখে তাকে সর্প জ্ঞানে ভীত হয়েছে।' এখানে রজ্জু–বিশেষ্যক সর্পত্ব–প্রকারক হরিদাসের ভ্রমজ্ঞান যদি ঈশ্বরের জ্ঞানের বিষয় হয়, তবে ঈশ্বরের জ্ঞানও রজ্জু–বিশেষ্যক সর্পত্ব–প্রকারক হয়ে দাঁড়ায়। ফলে ঈশ্বরের জ্ঞানেও ভ্রমত্ব উপস্থিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী বলে প্রতীয়মান হয়।

উত্তরে বলা হয় 'হরিদাস রজ্জুকে সর্প বলে জানছে'— এই জ্ঞানটি নিজে ভ্রমাত্মক নয়। কারণ, যিনি প্রকৃতপক্ষে জানেন যে সেখানে রজ্জু বিদ্যমান, তাঁর পক্ষেই এ রূপ জ্ঞান সম্ভব যে— 'হরিদাস রজ্জুকে সর্প বলে জানছে।' হরিদাসের ক্ষেত্রে, রজ্জু দেখে 'এইটি সর্প'— এই জ্ঞানে বিশেষ্য রজ্জু এবং বিশেষণ সর্পত্ব; ফলে এই জ্ঞান ভ্রমাত্মক। ন্যায়শাস্ত্রের পরিভাষায়— 'তদভাববৎ বৃত্তি বিশেষ্যতা নিরূপিত তন্নিষ্ঠ প্রকারতাশালী জ্ঞানই ভ্রম।' কিন্তু ঈশ্বরীয় জ্ঞান হলো—"হরিদাসের ভ্রমজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞান।" এখানে বিশেষ্য হচ্ছে হরিদাসের ভ্রমজ্ঞান এবং বিশেষণ হচ্ছে সেই ভ্রমজ্ঞাননিষ্ঠ সর্পত্ব–প্রকারকত্ব। এই প্রকারকত্ব বাস্তবেই হরিদাসের ভ্রমজ্ঞানে বর্তমান। অতএব ঈশ্বরীয় জ্ঞান অযথাবৎ পদার্থাবগাহী নয় এবং তাই তা ভ্রমাত্মক হয় না।

সুতরাং ঈশ্বর ভ্রান্ত নন; তিনি ভ্রান্তিজ্ঞ মাত্র। অর্থাৎ অন্যের ভ্রমজ্ঞানকেও যথার্থরূপে জানেন। এই নিয়ম অনুসারে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আমরাও ভ্রান্ত না হয়েও ভ্রান্তিজ্ঞ হতে পারি।

উপসংহার : অতএব ন্যায়দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব যুক্তি ও বিচার দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও মহর্ষি গৌতম ও পরবর্তী নৈয়ায়িক আচার্যগণ স্পষ্টভাবে নির্দেশ করেছেন যে, ঈশ্বরকে কেবল যুক্তির পরিসরে আবদ্ধ করা যায় না। যুক্তি ঈশ্বরবোধের পথ প্রস্তুত করে, কিন্তু তাঁর প্রকৃত উপলব্ধি ঘটে আত্মানুভূতি ও অন্তর্দর্শনের মাধ্যমে। কারণ ঈশ্বর শুধু জগতের নিমিত্তকারণ নন, তিনি সর্বব্যাপী, অন্তর্যামী এবং সকল সৃষ্টির মধ্যেই নিহিত। এই উপলব্ধির পথ হলো আত্মজ্ঞান। আত্মা যেহেতু পরমাত্মারই অংশ, তাই আত্মোপলব্ধির মাধ্যমেই ঈশ্বরবোধ সম্ভব। শ্রবণ–মনন–নিদিধ্যাসনের ধারাবাহিক সাধনার দ্বারা, সৎগুণার্জন ও নিষ্কাম কর্মের মাধ্যমে, এবং সমগ্র সৃষ্টিকে ভালোবাসার চর্চায় মানুষ ক্রমশ স্রষ্টা ও সৃষ্টির অন্তর্নিহিত ঐক্য উপলব্ধি করতে পারে। এই ঐক্যবোধ থেকেই জন্ম নেয় সর্বজীবে প্রেম, সেবা ও করুণা— যা প্রকৃত ঈশ্বরভক্তির লক্ষণ।

ন্যায়কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থে আচার্য উদয়ন যুক্তির সূক্ষ্মতম স্তরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করলেও, তাঁর গ্রন্থের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এই যে—যুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটেই ঈশ্বরানুভবের সূচনা। ঈশ্বরজ্ঞান কেবল তত্ত্বগত আলোচনায় সীমাবদ্ধ নয়; তা ধ্যান, উপাসনা ও ঈশ্বরকৃপা-নির্ভর এক জীবন্ত সাধনা। মুক্তি বা মোক্ষের পথেও সাধনার সঙ্গে অপরিহার্যভাবে প্রয়োজন ঈশ্বরের অনুগ্রহ।

অতএব ন্যায়দর্শনের ঈশ্বরতত্ত্ব আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে, যুক্তিবিচার ও জ্ঞানচর্চা অপরিহার্য হলেও সেগুলিই শেষ কথা নয়। ঈশ্বরের প্রকৃত মহিমা উপলব্ধি করতে হলে জ্ঞানচর্চার সঙ্গে গভীর ধ্যান ও আন্তরিক উপাসনা আবশ্যক—যাতে দেহে, মনে ও প্রাণে সমগ্র বিশ্বজুড়ে তাঁর উপস্থিতির আলো, শান্তি ও আনন্দ অনুভূত হয়।

এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই কাম্য যে, ঈশ্বরভক্তির আলো একদিন নিরীশ্বরবাদীদের মনেও আলোড়ন তুলবে এবং সমগ্র মানবসমাজে আধ্যাত্মিক চেতনার বিস্তার ঘটাবে। মানুষ যেন সকলের মধ্যেই ঈশ্বরকে দেখতে শেখে এবং ঈশ্বরজ্ঞানে সকলকে ভালোবাসে। তবেই প্রকৃত ঈশ্বরভক্তি বিকশিত হবে এবং পরমেশ্বরের করুণালাভ সহজ হবে।

শৈশব থেকেই ঈশ্বরভাবনা ও বিশ্বাস মানবজীবনে স্থিতি, সাহস ও শান্তি এনে দেয়— এ কথা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও প্রমাণ করে। জীবনের দুঃখ, সংগ্রাম, একাকিত্ব ও প্রতিকূলতার মধ্যেও ঈশ্বরচিন্তা মানুষকে অবিচল রাখে এবং এগিয়ে চলার শক্তি জোগায়। এই বিশ্বাসেই দৃঢ় প্রত্যয় জন্মায় যে, বিশ্বসংসারের প্রতিটি ঘটনা তাঁরই নির্দেশে সংঘটিত হয় এবং ভবিষ্যতেও তিনিই পথপ্রদর্শক ও রক্ষাকর্তা হয়ে থাকবেন।

এই জ্ঞানচর্চা ও সাধনার শেষ সীমা কোথায় তা মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। একমাত্র নিশ্চিত সত্য এই যে, জন্মজন্মান্তরে সেই সর্বব্যাপী পরমাত্মাই চিরসঙ্গী হয়ে পথ দেখাবেন— এই বিশ্বাস ও প্রার্থনাই ন্যায়দর্শনের ঈশ্বরচিন্তার চূড়ান্ত অভিমুখ।

[24]. দাস, রামসুখ। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* গোরখপুর : গীতা প্রেস, ২০১১, পৃঃ ১২৫৫।

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:2(4), February 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

গ্রন্থপঞ্জী :

১)) আচার্য, উদয়ন। *ন্যায়কুসুমাঞ্জলি* ড. চন্দন ভট্টাচার্য্য কর্তৃক সম্পাদিত। কলকাতা : মহাবোধি বুক এজেন্সি, ২০১৪।

২) আচার্য, উদয়ন। *ন্যায়কুসুমাঞ্জলি* শ্রীমোহন ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত। কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৯৫।

৩) আচার্য, উদয়ন। *ন্যায়কুসুমাঞ্জলিঃ* শ্রীশ্যামাপদ মিশ্র কর্তৃক সম্পাদিত। কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৯০ (বঙ্গাব্দ)।

৪) আচার্য, বিশ্বনাথ। *ন্যায়সূত্রবৃত্তিঃ* সেখ সাবির আলি কর্তৃক সম্পাদিত। কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১৫।

৫) আচার্য, বিশ্বনাথ। *ভাষাপরিচ্ছেদা* আশুতোষ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক সম্পাদিত। কলকাতা : বিজয়ায়ন, ১৪১৩ বঙ্গাব্দ।

৬) গঙ্গেশোপাধ্যায়। *তত্ত্বচিন্তামণি*। ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য কর্তৃক সম্পা.। কলকাতা : দণ্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম, ১৪১৭ (বঙ্গাব্দ)।

৭) ঠাকুর, অনন্তলাল। *ন্যায়ভাষ্যবার্তিকম্* নিউ দিল্লি : আই. সি. পি. আর., ১৯৯৭।

৮) ঠাকুর, অনন্তলাল। *ন্যায়বার্তিকতাৎপর্যটীকা* নিউ দিল্লি : আই. সি. পি. আর, ১৯৯৬।

৯) তর্কবাগীশ, ফণীভূষণ। *ন্যায়দর্শন (ন্যায়সূত্র ও ভাষ্য, চতুর্থ খণ্ড)*। কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৮।

১০) দাস, রামসুখ। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* গোরখপুর : গীতা প্রেস, ২০১১।

১১) বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র। *মনুসংহিতা* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৯।

১২) শাস্ত্রী, গৌরীনাথ। *ন্যায়মঞ্জরী* বারাণসী : সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮২।

১৩) শাস্ত্রী, দ্বারিকাদাস। *ন্যায়ভাষ্যম্* বারাণসী : বৌদ্ধভারতী, ১৯৯৮।

১৪) শ্রীবাস্তব, ড. বিজয়। তার্কিকরক্ষা। বারাণসী : কলা প্রকাশন, ২০০৯।

১৫) সিদ্ধান্ত শিরোমণি, আচার্য বিশ্বেশ্বর। *ন্যায়কুসুমাঞ্জলি* বারাণসী : চৌখম্বা বিদ্যাভবন, ১৯৬২।

১৬) Varadacharya, K. S. *Nyāyamañjarī (Vol. 1).* Mysore : Oriental Institute, 1969.